হারিয়ে যাওয়া শব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

‘ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি’...। আমাদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ শব্দ ভাণ্ডার অনেক বেশি পেয়েছিলেন, যে-কোনো ছন্দের মাত্রা-সঙ্গতি রক্ষার জন্য তিনি এবং তাঁর সময়ের কবিরা অনায়াসে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন, যার অনেকগুলি থেকেই আমরা আজ বঞ্চিত। এই পংক্তিটিতেই ‘মম’ শব্দটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, অথচ কী মধুর শব্দটি। আমরা শুধু ‘আমার’ ব্যবহার করি, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল আরও দুটি প্রতিশব্দ, ‘মম’ আর ‘মোর’। ‘মোর’ শব্দটি সম্পর্কে আমার দুর্বলতা নেই, কিন্তু ‘মম’ সম্পর্কে বিচ্ছেদ বেদনা বোধ করি, আর কোনোদিন তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না?

এই পংক্তিটিতেই রয়েছে ‘আজি’ এবং ‘রাতি’। ‘আজ’ কিংবা ‘আজকে’-র বদলে ‘আজি’ এখন অব্যবহার্য, যেমন ‘রাত’ বা ‘রাত্রি’ এখনকার বাংলায় চলে, কিন্তু ‘রাত্রি’ বাতিল হয়ে গেলে? রবীন্দ্রনাথদের সুবিধে ছিল এই যে, তাঁরা ইচ্ছে মতন যে-কোনো একটা ব্যবহার করতে পারতেন, একই কবিতায় ‘মম’ ও ‘আমার’ চলে যায়। যেমন, ‘আমার বনে বনে ধরল মুকুল’, এর একটু পরেই ‘যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া’।

যে-কোনো ভাষায় শব্দ ভাণ্ডারেরই চরিত্র অতি বিচিত্র। যেমন নিত্যনতুন শব্দ এসে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি অনেক শব্দ অপ্রচলিত হয়ে যায়। এই যোগ ও বিয়োগ ঠিক কোনো নিয়ম মানে না এবং হারানো ও প্রাপ্তির মধ্যে কোনো ভারসাম্যও থাকে না। জোর করে যেমন নতুন নতুন শব্দ ঢোকানো যায় না, সেগুলি হাওয়ায় উড়ে এলেই গ্রহণীয়, তেমনই বাতিল শব্দগুলিকেও ধরে রাখার উপায় নেই। কানে বেসুরো শোনায়। জোর জবরদস্তির চেষ্টা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন, শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনার জন্য সংস্কৃত থেকে প্রচুর শব্দ ধার করে আনলেন, যেমন ইরম্মদ, আহব ইত্যাদি, অভিধান থেকে তাদের অর্থ উদ্ধার করে গেলেও ধ্বনিগুলি আমাদের অপরিচিত এবং মনশ্চক্ষে কোনো চিত্র ফুটে ওঠে না। তাই মাইকেল আমাদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে রইলেন। তাঁকে অনুসরণ করা যে কত বিপজ্জনক তা বুঝতে না পেরে সেই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রচুর আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করলে সে ভাষা কৃত্রিম হতে বাধ্য। সেই জন্যই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্যান্য আকর্ষণীয় উপাদান থাকলেও স্মরণীয় পংক্তি খুবই কম। যেসব পংক্তি পাঠকদের প্রিয় হয়েছে, তাতে কিন্তু আভিধানিক শব্দ একেবারেই নেই, যেমন ‘একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী/একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।’

সব শব্দই হল একটি প্রতীক। সামান্য কয়েকটি রেখায় আঁকা হয় এক একটি অক্ষর, পাশাপাশি কয়েকটি নির্বাচিত অক্ষরে রচিত হয় এক একটি শব্দ। এই শব্দগুলির অসীম ক্ষমতা, এর ধ্বনি, এবং ধ্বনির সাহায্যে কোনো ভাব বা বস্তুচিত্র সঠিকভাবে ফুটে ওঠা চাই। কয়েকটি মাত্র শব্দে ফুটিয়ে তোলা যায় গোটা বিশ্ব। এই শব্দগুলি এতই স্পর্শকাতর যে আকৃতির সামান্য হেরফেরও এরা সহ্য করে না। যেমন ‘রানী’ শব্দটি থেকে সামান্য র-এর ফুটকিটা বাদ গেলেই তার রানীত্ব ঘুচে যায়। ‘কণ’ শব্দটির ণ-এ যদি মাত্রা পড়ে যায়, কিংবা ‘সূত্র’ শব্দের স যদি সামান্য বেঁকে ম হয়ে পড়ে, তবে নিদারুণ অর্থান্তর ঘটে যেতে পারে!

অনেক ভাষায় অক্ষরগুলিই ছবির মতন। যেমন মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক্স ছিল ছবি-ভাষা। চিনা ও জাপানি অক্ষরবিন্যাসেও ছবির আভাস। আবার অনেক ভাষা শুধুই প্রতীকী। বাংলাও তাই-ই।

যন্ত্র বা কণ্ঠে সৃষ্টি হয় সঙ্গীত। আর রং-তুলিতে সৃষ্টি হয় ছবি। কিন্তু শব্দ দিয়ে মনের ভাব ও ছবি, সবই ফোটানো যায়। বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল শব্দ চোখে পড়া বা শোনা মাত্র আমরা সে ভাব বুঝি। আবার আকাশ বা সিংহ শব্দ মুহূর্তের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে ছবি। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন ভাষার সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিতি ও পূর্ব সংস্কার। নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় এটা আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। বাংলা 'রূপসী' শব্দটি আমাদের মনে যে অনুভূতির সঞ্চার করে একজন তামিলভাষীর সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। যেমন রূপসীর তামিল প্রতিশব্দের কাছে আমরা নির্বোধ। ভালোভাবে শিখে নিয়ে অন্য ভাষায় কাজ চালানো যায়, কিন্তু কবিতা যে-হেতু অনেক বেশি শব্দের সূক্ষ্মতা ও ধ্বনি ব্যঞ্জনাবোধের দাবি করে, তাই অন্যভাষায় কবিতা রচনা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়, পুরোপুরি রসগ্রহণও সম্ভব কি না জানি না। টি এস এলিয়ট ফরাসি ভাষায় বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও তা রসোত্তীর্ণ হয়নি। ইদানিং অনেক ভারতীয় লেখকের ইংরেজি ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখে প্রচুর নাম ডাক হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা কেউ কবিতা লেখেন না ঐ ভাষায়। একমাত্র বিক্রম শেঠ গোড়ার দিকে 'দা গোল্ডেন গেট' নামে একটি সংলাপ কাব্য লিখেছিলেন বটে, তাতে কবিত্বের চেয়ে চাতুর্যই বেশি প্রকট।

নতুন নতুন যে-সব শব্দ আসে, সেগুলির ধ্বনি ও ছবি আয়ত্ত করতে কিছু সময় লাগে। অধিকাংশ শব্দই আসে প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন টুথ পেস্ট, স্নো, ক্রিম, পাউডার। এর বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজা নিরর্থক। এমনকি কনডেন্সড মিল্কও দিব্যি চলে গ্রামাঞ্চলে। হয়তো কালক্রমে এই শব্দগুলি কিছু কিছু বদলে গিয়ে দিশি রূপ নেবে। যেমন টিউবওয়েল হয়ে গেছে টিউকল। স্কুল হয়েছে ইশকুল। যে-সব শব্দ সহজে উচ্চারণ করা যায় এবং সংক্ষিপ্ত, সেইসব শব্দই বেশি গ্রহণীয়, যেমন মস্যাধারের বদলে দোয়াত, কিন্তু কিতাব-এর বদলে বই-ই জনপ্রিয়।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিদেশি বা বহিরাগত যে-সব শব্দ বাংলায় এসেছে, তা সবই বস্তুবাচক, ভাববাচক নয়। অনেক তৎসম ও তদ্ভব শব্দকে হটিয়ে দিয়ে আরবি-ফারসি বা ইংরেজি শব্দ স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়েছে, সেগুলি জিনিসপত্রের নাম। কিন্তু প্রেম, ভালোবাসার বদলে পেয়ার, মহব্বৎ, লাভ বাংলায় চলেনি। দুঃখের কোনো প্রতিশব্দের দরকার হয়নি। ব্যথা, অস্পষ্টতা, বিরহ খাঁটি বাংলা অনুভূতিই রয়ে গেছে। তবে হিংসে ও বিদ্বেষের মাঝামাঝি যে শব্দটি, ঈর্ষা, সেটা যেন একটু একটু পিছিয়ে আভিধানিক হবার পথে, অল্প বয়েসীরা অনেকেই 'জেলাসি' ব্যবহার করে। তৎসম 'ক্রেতা' শব্দটিকে হঠিয়ে দিয়েছিল খরিদ্দার বা খদ্দের, এখন আবার সেটাকে হঠিয়ে দিচ্ছে কাস্টোমার।

মুখের ভাষার স্বীকৃতিই কোনো নতুন শব্দের গ্রহণযোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। আগে মনে করা হতো, মানুষের মুখের ভাষা ও গ্রন্থ রচনার ভাষা আলাদা হবে। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই সাধু ও চলিত দুটি রূপ ছিল। আমাদের দেশে যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কমলকুমার মজুমদার আরও এক কাঠি বাড়িয়ে বলতেন, সাহিত্যের ভাষা হচ্ছে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপ, সাধারণ পাঁচ-পেঁচি লোকের হাটে-বাজারের ভাষা থেকে তা আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু এখন তো সাধারণ মানুষদেরই জয় জয়কার, দেবী-টেবীরাও সাধারণ মানবী হয়ে গেছে। গদ্য তো মুখের ভাষাকে অনুকরণ করেই, কবিতাও মুখের ভাষার চলন থেকে বেশি দূরে যেতে পারে না। জমিদার তন্ত্র ও সাধুভাষার বিলোপ একই সঙ্গে ঘটেছে, এ রকম বলা যেতে পারে?

যে-সব শব্দ বর্জিত হচ্ছে, নির্জীব হয়ে পড়ে থাকছে অভিধানের পাতায়, তাদের এই নির্বাসন দণ্ডের সঠিক যুক্তি সবসময় পাওয়া মুশকিল। সাধু ক্রিয়াপদ হঠে গেছে স্বাভাবিক কারণে। চলিত ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত, উচ্চারণও সুবিধেজনক। কিন্তু অনেক বস্তুবাচক শব্দ হঠে যাবার কারণ কী? সেগুলি আসলে প্রতিশব্দ। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো জীবন্ত ভাষাই

বেশি প্রতিশব্দ সহ্য করে না। সংস্কৃতভাষায় প্রায় প্রতিটি শব্দেরই একাধিক প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ আছে, এবং এই গুণটিই নাকি সংস্কৃতভাষার অপমৃত্যুর কারণ। প্রতিশব্দগুলি সম্পর্কে সেই ভাষার মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, কারণ সেই শব্দগুলি থেকে আর ছবি ফোটে না, ব্যঞ্জনাও স্তিমিত হয়ে যায়। যেমন সূর্য শুনলেই তক্ষুণি আমাদের চোখের সামনে একটা জ্বলজ্বলে ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু সূর্যের যে একগাদা প্রতিশব্দ, যেমন আদিত্য, দিবাকর, রবি, ভাস্কর ইত্যাদিতে সেই ছবি নেই। তাই বাংলাতে আজ সূর্যের আর কোনো প্রতিশব্দের ব্যবহার সেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজের নামটি এতই ভালোবাসতেন যে রবি শব্দের ব্যবহার করেছেন বহু বহুবার।

একেবারে কোনো প্রতিশব্দ না থাকলে সে ভাষা বর্ণহীন হয়ে পড়বে না? বাইরে থেকে যতই শব্দ আসুক, নিজস্ব ভাষা থেকে বর্জনের সংখ্যা বেশি হলে সে ভাষা হীনবল হয়ে যেতে বাধ্য। এ যেন এক ফুটো পাত্র, ওপর থেকে শব্দ এসে ভরছে, কিন্তু তলা থেকে টুপটাপ করে যে কত শব্দ খসে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা 'জান্‌লা'র কোনো প্রতিশব্দ এখন আর ব্যবহার করি না। বড়জোর 'জানালা' এখনো চলে, তাও বেশিদিন চলবে না। কারণ 'জানালা' আর মৌখিক নয়, বড় কাব্যগন্ধী। যেমন স্বপ্নের বদলে স্বপন কিংবা তৃষ্ণার বদলে তৃষা বা তিয়াষ অচল। কিছুদিন আগেও জান্‌লার দুটি প্রতিশব্দের বেশ ব্যবহার ছিল, 'বাতায়ন' ও 'গবাক্ষ'। এর মধ্যে 'গবাক্ষ' এখনো ঐতিহাসিক উপন্যাসের গদ্যে চলতে পারে, কিন্তু 'বাতায়ন' কী দোষ করলো? আমরা নতুন করে 'বাতানুকূল' শব্দটি চালাবার চেষ্টা করছি। অবশ্য বাতানুকূলের সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা চলছে 'এয়ার কন্ডিশন্‌ড'-এর, কে জিতবে ঠিক নেই, দুটোই মুখে মুখে চলছে কম-বেশি, তা হলেও 'বাতানুকূল' এখন কবিতায় স্থান পেতে পারে। 'বাতায়ন' কেন পারবে না? 'আকাশ' শব্দটিও অবধারিত চিত্ররূপময়। আকাশের কত প্রতিশব্দ, সবই ক্রমে ক্রমে অব্যবহার্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ আকাশের চিত্রটি তো সব সময় এক নয়, সবসময় বর্ণও নীল নয়। আকাশের অন্তত একটা-দুটো প্রতিশব্দও ফিরিয়ে আনা যায় না? বজ্র বিদ্যুতের আকাশের নাম গগন তো হতেই পারে। আকাশের আর এক নাম 'পবন-পদবী', অভিনবত্বের জন্য এটাকেও কখনো এনে ফেলা যায়।

আমাদের যৌবনকালে আধুনিক বাংলা থেকে জোর করে 'সাথে' শব্দটিকে তাড়াবার চেষ্টা চলছিল, কবিতা থেকে তো বটেই, গদ্য থেকেও। জোর করে বলার কারণ, তখনো 'সাথে' এবং 'সঙ্গে' দুটিই মানুষের মুখে উচ্চারিত হতো। কিন্তু 'সাথে'-তে যেন রয়েছে গ্রাম্যতা দোষ, 'সঙ্গে' সঠিক নাগরিক। একটি বড় পত্রিকার রচনা-প্রেরকদের উদ্দেশে নিয়মাবলীতে বলা হতো, 'সাথে'র বদলে 'সঙ্গে' লিখবেন। কল্লোল যুগের কবিরা, জীবনানন্দ সমেত, সাথের সাথী ছিলেন, এখন 'সাথে' উৎখাত হয়ে গেছে। ঐ সময় থেকেই বাংলা কবিতা থেকে 'দখিন হাওয়া'-কে বিদায় করে দেওয়া হয়। তার কারণ বহু ব্যবহারে, বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথ দখিন হাওয়া নিয়ে এতবার মাতামাতি করেছেন বলেই পরবর্তী কবিদের কাছে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিছু কিছু শব্দের ওপর রবীন্দ্রনাথের ছিল বেশি বেশি দুর্বলতা, সেগুলি তিনি এতবার ব্যবহার করেছেন যে তাঁর রচনাবলীর বাইরে পা ফেলার শক্তি আর নেই সেইসব শব্দদের। সে রকম একটি শব্দ তালিকা তো করাই যায়, এবং সে তালিকা হবে সুদীর্ঘ।

একটি মজার উদাহরণ দিয়ে এই রচনা শেষ করি। আমরা সেতার, সরোদ, বাঁশি, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, অর্গান, তানপুরা, শানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শুনতেই অভ্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় বীণার ছড়াছড়ি। সরস্বতী মূর্তির কোলে কাছে বীণা থাকে, কিন্তু ঐ সরস্বতী নিশ্চিত বাঙালি নন, কারণ বাংলায় বীণা মোটেই জনপ্রিয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এত বীণা শুনলেন কোথায়? 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি', ... 'বুঝতে নারি বনের বীণা তোমার প্রসাদ পাবে কি না', ... 'শরৎ বাণীর বীণা বাজে কমলদলে' ... 'বাজাও, বাজাও, বীণা বাজাও, ভুলাও ভুলাও', ... 'ঝিবীণা রবে' ... 'আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে', এক্ষুণি এই পংক্তিগুলি মনে আসছে, আরও কত যে আছে তার ঠিক নেই। বীণা-কে এখন বলে বীণ্, তা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়, রবীন্দ্রনাথ তবে এত মুগ্ধ হলেন কী করে?

রবীন্দ্রনাথের বীণার বাড়াবাড়িতে তিতিবিরক্ত হয়ে একালের কবিরা কেউ ভুলেও একবারও বীণার উল্লেখ করেন না!

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com